ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 FEB 1987
01 [illegible] ... 6 ... কলাম 3 ...

দৈনিক বাংলা

শিক্ষা, শিক্ষার্থী আর শৃংখলা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সকলে একমত। যে যেখানে আছেন—আন্তরিকভাবে চান শিক্ষায়তনগুলো শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষা প্রদানের কাজে নিবেদিত হোক। আশার কথা, বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এজন্য সরকার কিছু একটা করতে বদ্ধপরিকর।

যেকোনো সংকট নিরসনের প্রধান ধাপ হচ্ছে সংকট চিহ্নিত করা। দুর্জ্ঞেয় ব্যাধি যেমন চিকিৎসার বাইরে, ঠিক তেমনি দুর্বোধ্য সমস্যাও সমাধানের আওতায় নয়। আজকের উঁচু-নিচু সর্বস্তরে শিক্ষা বিশৃংখল অবস্থায় আছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সর্বত্র রকমফেরে চিত্রটি এক—নৈরাজ্য। এখন প্রশ্ন, কেন? উঁচু পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে না হয় বিস্তর কথা বলা যায়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েই কি কোন সান্ত্বনা আছে?

অতীতের দৃষ্টান্ত টানা মূঢ়তা। কিন্তু অতীতকে না টেনে উপায়? বিশেষ করে যে অতীত কল্পনা নয়? মাত্র বিশ-পঁচিশ বছর আগেও, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত ছিল বড় মজবুত। গ্রামের প্রাইমারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদানের মান ছিল অপূর্ব। প্রাইমারী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় গ্রামের ছাত্রদের সঙ্গে শহর মার খেতো। বিশেষ করে বাংলা (ব্যাকরণসহ) ও অংকে গ্রামের প্রাইমারীর পাঠ ছিল অতুলনীয়। সেই গ্রামের স্কুলগুলোর এমন দশা কেন? পরিবর্তন পরিবর্ধন তো অনেক হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন সরকারী, স্কুলগুলোতে প্রায়ই ইটের গাঁথুনি চুনকাম, যথেষ্ট না হলেও তুলনা করতে গেলে আগের চেয়ে অবস্থা এখন ভালো। তাহলে পাঠের মান এমন নেমে গেলো কেন? আজ গ্রামগঞ্জ থেকে বৃত্তি দূরের কথা—কটি ছাত্র ভালো ফল করে? হাতের লেখা, বানান, উচ্চারণ—কোথায় গেলো সেই ব্যাকরণ, সেই ভাষা জ্ঞান? অংকের ব্যুৎপত্তি হারিয়ে গেলো কোথায়?

অবশ্য একই কথা শহরেও। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা পুরোপুরি ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। ব্যক্তি পর্যায়ে অভিভাবকের তদারকিতে এই স্তরের শিক্ষা টিকে আছে। আর কিছু লোকের জন্য আছে কিন্ডার গার্টেন। অত্যধিক ছাত্রবেতন সত্ত্বেও যে কিন্ডার গার্টেন এত ছাত্র টানছে, তার কারণ যতটা না তার ইতিবাচক দিক—তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী স্কুলের নেতিবাচক দিক। ব্যক্তিমালিকানার এইসব প্রতিষ্ঠান মুখ্যত বাণিজ্যিক বলে এবং দৃশ্যত সরকারী হিসাব-বহির্ভূত বলে তাঁরা ব্যবসায়ী মনোভঙ্গিতে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের শূন্যতা অনুধাবন করে টোপ ফেলেছেন। ইংরেজী ভাষার লিখিত জ্ঞানের চেয়ে প্রাধান্য দেন ভাষার মৌখিক পারদর্শিতার ওপর। কায়দা-কানুন, দেশীয় নয়। ফলে চমক আর চাকচিক্য ছড়িয়ে তাঁরা জনচিত্ত জয় করেছেন। লক্ষণীয় যাঁরা কিন্ডার গার্টেন নিয়ে চেঁচান—তাঁরাই সন্তান কিউ দিয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। হালের ইংরেজী সিলেবাস এমন যে ইংরেজী মাধ্যমের ছাত্র না হলে তাতে পাস করা সহজ নয়। এসএসসিতে দুশো নম্বর ইংরেজীতে ঠিক মাতৃভাষার মতোই প্রাধান্য তাতে। এসব পড়ানোর জন্য বিশেষ টীচারও লাগে। তাই সামর্থ থাকলে অভিভাবক ছেলেকে নিয়ে দৌড়ান কিন্ডার গার্টেনে।

তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়াচ্ছে? প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যাপীঠগুলো মানের দিকে অনেক নেমে গেছে শহরে-বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে, অন্যদিকে এ সুযোগে কিন্ডার গার্টেন যাঁদের প্রতিপত্তি ছড়িয়ে বাজিমাৎ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ব্যাপারটি এমনি লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রীধারী সচ্ছল সপ্রতিভ মহিলারা সাধারণ স্কুল-কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কিন্ডার গার্টেন খোলেন। ইংরেজী বোলচালের সাধ্য থাকলেই আর অন্যের স্কুল নয়, নিজের স্কুল। প্রাথমিক অবস্থায় কিছু মূলধন লাগে, আসবাবপত্র, শিক্ষক বেতন, বাড়িভাড়া, এর পরে কেবলি লাভের পালা। কাজেই এ সত্যটি অনুধাবন করতে হবে, কিন্ডার গার্টেনকে এমন বিস্তারের অলক্ষ্য সুযোগ দিয়েছে আমাদের বিরাজমান হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশ। যদি সাধারণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বুনিয়াদ শক্ত হত, পাঠপদ্ধতি ও পরিবেশ আকর্ষণীয় হতো—তাহলে অন্য যেকোনও সিসটেম দাঁড়াতেই পারত না।

শিশু-শিক্ষা আজ বড় সমস্যা। আড়াই তিন বছরের বাচ্চা নিয়েও মায়েরা দৌড়ান 'প্লে-গ্রুপে' দিতে—সেখানে টাকা যতো হাতড়ানো হয়, খেলাধুলো তেমন না। এই স্তর শেষে আসে মাধ্যমিক। কিছু কিছু স্কুল 'ও-লেভেল' 'এ-লেভেলের' ব্যবস্থা রেখে অভিভাবককে প্রলুব্ধ করেন এবং সফলও হন। সফলতা এ কারণে যে—তাতে করে বিদেশী জলপানি জুটবে সহজে। কান টানলে মাথা আসে—তাই এক কথায় সবই আসছে। বাবা-মা দেখেন সন্তানের ভবিষ্যৎ। দেশের শিক্ষায় একদিকে তাঁদের আস্থা নেই—অন্য দিকে নেই ভবিষ্যতের ভরসা। তাই এমন কিছু গোড়া থেকেই চান যার কল্যাণে সন্তানের স্কুল শেষের পড়াও সহজ হয় এবং সহজলভ্য হয় তারও পরের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এসএসসিতে যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ফি-বছর ফেল করে, তাদের সকলেই কি ব্যর্থ? পুরো নয়টি বিষয়ে ভালো করে মাত্র একটিতে কিঞ্চিৎ খারাপ করলেই তো তার সব গেলো? বেশ আগে তো কম্পার্টমেন্টাল ছিল, কালগুণে তাও উঠে গেছে। কী করে ফেল করানো যায়—এই যদি লক্ষ্য হয়, পাসের সংখ্যা বাড়ে কী করে? এ নিয়ে ১৯৮৬ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ ও দিগ্‌দর্শন আছে কিন্তু লাভ হয়নি। যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

যে ক্ষীণসংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক টপকায়— তারা কজনে উচ্চ মাধ্যমিকে স্থান পায়? মজার এই, আমাদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সকলের মেধা একই খাতে প্রবাহিত হতে হবে, ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল্যে মর্যাদা কিছুই সৃষ্টি হলো না আজ অবধি এদেশে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন রীতিমত ক্লাস হতে পারে না অনেক কলেজেই। এর মধ্যে বিস্তর বনেদী কলেজও আছে। বছরের মধ্যে পরীক্ষা দূরে থাক, বছর শেষের বার্ষিক নির্বাচনী পরীক্ষাও দিতে উৎসাহী নয় ছাত্ররা। কর্তৃপক্ষের প্রয়াস বৃথা যায়, শেষে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। [illegible] এ মানসিকতা, কলেজের পরীক্ষা না দেয়ার মানসিকতা, দ্রুত বাড়ছে। আজকের দিনে ঢাকা শহরেই কটি কলেজে বার্ষিক নির্বাচনী পরীক্ষা গৃহীত হতে পারে। জরীপ করলে হতাশ হতে হবে।

যে মুষ্টিমেয় অংশ উচ্চমাধ্যমিকের ভবতরী পার হয়, তাদের যেন আর পর থাকে না, সীমাহীন দিনরাত্রি। অপচয় ঘটে উদ্যমের ও শক্তির। সবখানে সকলে ভর্তি হতে পারে না—কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান ছয় মাস না গেলেও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ হয় না। তারিখ দিলেও ভর্তির আশা নেই।

আজকের দিনে সেশন-জট একটি অতি পরিচিত শব্দ। কয়েক বছরের সেশন তাল গোল পাকিয়ে এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে বর্ণনার নয়। এ কারণেই দাবী, সরকারী চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির। তাও অগ্রাহ্য। এই বিপুল সংখ্যক অলস অকেজো হয়ে থাকা তরুণ শিক্ষার্থীরা থাকে কোথায়?

এমন শত প্রশ্ন আজ শিক্ষাঙ্গণে। শিক্ষাঙ্গণ একটি ব্যাপক পরিধি—প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। সীমিত সংখ্যায় প্রকৌশলী, চিকিৎসা ও কৃষি। মাধ্যমিক স্তরে ক্যাডেট। আর আছে মাদ্রাসা সর্বস্তরে। এই বিশাল চত্বরে আজ সবচেয়ে যার অভাব তা হচ্ছে আস্থা, শ্রদ্ধা, স্থিতি ও নিশ্চয়তার। যেহেতু শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ দেখছে অশ্রদ্ধ, সেহেতু তার মধ্যে বাসা বাঁধছে নৈরাজ্য।

দেহ যখন তার প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায়, তখন সহজেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। শারীরিক সুস্থতা অটুট রাখার সংগ্রামে পরাস্ত হয়। এটা কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য নয়। সর্বত্রই এ প্রযোজ্য। আজকের কিশোর তরুণ সম্প্রদায় কেন অভিভাবক শিক্ষকদের কথা শুনছে না, তা অস্পষ্ট নয়। জীবনের সুনিশ্চিত পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ অভিভাবক কী করে আশা করবেন, সন্তান হবে সুবোধ সুশীল বালক?

যে বিশাল অংশ শিক্ষার আলোর বাইরে, তাদের যদি এ জগতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে আরও জোর দিয়ে বলা যায়—শিক্ষার পরিবেশ ছেড়ে শিক্ষার্থীকে সরিয়ে নিতে কেউ পারবে না।

—হোসনে আরা শাহেদ